১২ অগাস্ট ২০২২

শাহীদ আকতার

আমার নাম শাহীদ আকতার, জন্ম করাচিতে। পৈতৃকসূত্রে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার মানুষ। তবে আমি মূলত বেড়ে উঠেছি ঢাকা শহরের শুক্রাবাদে। ঢাকাতেই আমার স্কুল-কলেজ জীবন কেটেছে। তখনকার ঢাকা তুলনামূলকভাবে পরিচ্ছন্ন ছিল, এত ঘিঞ্জি ছিল না। আমাদের আমলে তো আর এখনকার দিনের মতো দুর্দান্ত সংযোগ প্রযুক্তি ছিল না, ডিজিটাল ম্যাপ ছিল না, যোগাযোগের এতরকম প্রযুক্তিও ছিল না, তবু আমি অত্যন্ত আনন্দময় শৈশব কাটিয়েছি। স্কুলের বন্ধুবান্ধব- পাড়া-প্রতিবেশীরা মিলে একটা চমৎকার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া ছিল, সবাই মিলে ফুটবল-ক্রিকেট খেলতাম। সে এক ভারী সুন্দর সময় কেটেছে আমার। গ্রামের সঙ্গেও আমার যোগাযোগ অক্ষুন্ন ছিল, প্রতি ছুটিতে আমরা চট্টগ্রামে যেতাম। আমার স্ত্রী রাখির গ্রামের স্মৃতি নেই, আমার আছে।

আমার বাবা অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, পাকিস্তান এয়ারফোর্সে কাজ করতেন, পরে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সে কাজ করলেন, ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের পর ন্যাশনাল এয়ারলাইন্স বাংলাদেশ বিমানে কাজ করতেন। অত্যন্ত পরিশ্রমী, স্নেহশীল মানুষ। তিনিই আমার আইডল। মা গৃহবধূ, অত্যন্ত স্নেহে-আদরে তিনি আমাদের বড় করেছেন, পড়ালেখার দিকে নজরদারি করেছেন। আমি খুব মা-ঘেঁষা ছিলাম, মায়ের কাছ থেকে প্রথম আলাদা হই মেরিন একাডেমিতে ট্রেনিং-এ যাবার পরে। বাবা-মা এখানে কয়েকবার এসেছেন কিন্তু এখানকার আবহাওয়া ওঁদের ভালো লাগে না। আমার বাবা-মা বেঁচে আছেন, তাঁদের সঙ্গ আমি খুব মিস করি। বাংলাদেশে আত্মীয়-পরিজন নিয়ে আমাদের যে মিলনমেলা ছিল, সেটা মিস করি। রাত ১০-১১টার সময়ও বাংলাদেশে বের হওয়া যায়, এখানে তো বিকেল পাঁচটার পরেই সব নিঝুম। এখানে অনেক ভালো সুযোগসুবিধা রয়েছে, তবু দেশের সেই সংস্কৃতি, সেই ঐতিহ্য অন্য রকম অনুভূতি আনে মনে।

আমরা তিন ভাই এক বোন, ভাইদের ভেতর আমি মেজ। বড়ভাই মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, এখন সিডনীতে থাকেন। আমার ছোটভাই ডাক্তার, বার্মিংহামে থাকে। ছোটভাইই আমাকে এখানে এসে স্থায়ী হবার পরামর্শ দিয়েছিল। একমাত্র বোন ডাক্তার বিয়ে করেছে, সৌদি আরবে থাকে। ভাইবোনে খুব সৌহার্দ্য আমাদের।

আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয়টা খুব বিচিত্রভাবে হয়। প্রেমের বিয়ে ছিল না। বাড়ি থেকে আমার জন্য পাত্রী দেখছে। আমার মামা-মামী ছিলেন স্পেশালিস্ট ডাক্তার, মামা মেডিসিন স্পেশালিস্ট, মামী চাইল্ড স্পেশালিস্ট। দুজনের চেম্বার পাশাপাশি। মামার চেম্বারে রাখী পেশেন্ট হিসেবে আসে, সে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের ছাত্রী। মামা তাকে কিছু টেস্ট করাতে দেন, তারপর কিছু কথাবার্তা বলে খুব পছন্দ করেন। পরদিন রাখীর ভাই রিপোর্ট আনতে গেলে আমার জন্য রাখীর বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব রাখেন। রাখীর ভাই আপত্তি জানিয়ে বলেন—রাখীকে

তো ছেলের বাড়ির কেউ দেখলোই না, এভাবে কি বিয়ে হয়? তখন মামা জানান, রাখী চেম্বার থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় মামা মামীকে এবং নানীকে ফোন করে জানান- যে মেয়েটি চেম্বার থেকে বের হয়ে যাচ্ছে তাকে একবার দেখতে। তাঁরা দেখেন। সেভাবেই শুরু। গত বছর আমাদের বিয়ের রৌপ্যজয়ন্তী পালন করলাম, ২৫ বছর হয়ে গেছে।

আমাদের দুই মেয়ে, এক ছেলে। বড় মেয়ের ২২ বছর বয়স, ডেনটিস্ট্রিতে ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী। মেজ মেয়ে সেকেন্ডারি স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে, ছোট ছেলের বয়স ১০- সে ক্লাস ফাইভে পড়ে। বড় মেয়ের কারণেই আসলে আমার সমুদ্রের ক্যারিয়ার ছেড়ে আসা। সংসার-সন্তান সব ফেলে কয়েকমাসের জন্য সমুদ্রে চলে যেতে হতো আমাদের, ভাবলাম সমুদ্র ছেড়ে এলে সংসারে কিছু সময় দিতে পারব। ছোট দুজন আমাদের ব্যতিব্যস্ত রাখে, বাবা-মা হিসেবে আমাদের ভূমিকাটা আমরা অত্যন্ত উপভোগ করি।

নানা ধরণের মানুষের সঙ্গে আমি মিশতে ভালোবাসি, আমার এখনকার পেশা আমাকে নানাজাতের মানুষের সঙ্গে মিশবার সুযোগ দিয়েছে। আমার দিন শুরু হয় অনেক সকালে, প্রায় ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সমুদ্রে। জাহাজের ক্যাপ্টেন হিসেবে আমি পৃথিবীর বহু মহাদেশে সমুদ্রপথে পাড়ি দিয়েছি। তারপর সমুদ্রের জীবন ছেড়ে ডাঙায় এসেছি। ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে কলেজের লেকচারার হিসেবে ৫ বছর পড়িয়েছি, পিজিসিই করতে হয়েছে আমাকে। তারপর নিউক্যাসেলে। এরপর শিক্ষকতা ছেড়ে সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়েছি, এখন সরকারী এজেন্সিতে শিপিং বিষয়ক সরকারী আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করি।

জাহাজের জীবনে যুক্তরাজ্য ছিল আমার দ্বিতীয় বাড়ি, ট্রেনিং-এ ছাত্রাবস্থায় বহুবার এসেছি। বাংলাদেশে আমাদের একই ইউকে কারিকুলামে ট্রেনিং দেয়া হয়। সমুদ্র আমাকে বরাবরই যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। আমি বাংলাদেশের বন্দরনগরী চট্টগ্রামের মানুষ, সেখানে সমুদ্র বন্দর রয়েছে। স্বভাবতই সমুদ্র আমাকে টেনেছিল। অ্যাপ্রেন্টিস বা শিক্ষানবিস হিসেবে শুরু করি আমি, প্রতিটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য আমাদের যুক্তরাজ্যে আসতে হয়েছিল কারণ যুক্তরাজ্যের সামুদ্রিক অভিজ্ঞতা এবং ইতিহাসের কারণে এখানকার সনদ বিশ্বময় স্বীকৃত। কয়েক বছর পরে আমি জাহাজের ক্যাপ্টেনের স্থলাভিষিক্ত হই। ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব গুরুদায়িত্ব, জাহাজের প্রতিদিনকার সবকিছুর জন্য তো বটেই এবং পুরো যাত্রার সার্বিক দায়িত্ব ক্যাপ্টেনের ওপর বর্তায়। যদিও এগুলো ছিল কার্গো জাহাজ, আমরা পৃথিবীর নানান স্থান থেকে কার্গো নিয়ে যেতাম। চাকরির সুবাদে প্রায় ৬০টির বেশি দেশ দেখবার সুযোগ হয়েছে আমার, যা অন্য কোনোভাবে সম্ভব ছিল না। ফলে ক্যাপ্টেন থাকাকালীন সময়টুকু আমি খুব উপভোগ করেছি। সেই পাঁচ-ছয় বছরের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই পরে এখানে এই দেশে আমি আমার জীবনকে গড়ে তুলেছি, কারণ আমি পৃথিবীবিখ্যাত সেফটি অরগ্যানাইজেশনে কাজ করেছি। ফলে এখন আমার কাজ জাহাজের সেফটি বা নিরাপত্তা বিধান করা। কলেজেও লেকচারার হিসেবে কাজ করবার সময় আমি এ নিয়ে বক্তৃতা দিতাম, আমার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ভাগ করে নিতাম। ক্যাপ্টেন হিসেবে আমার কাজ আমাকে পরবর্তী জীবনে এবং পেশায় তৃপ্তি দিয়েছে।

নরউইচে আসি আমাদের এক আত্মীয়ের পরামর্শে। তিনিই প্রথম আমাদের ঘুরিয়ে দেখান, প্রথম দিকের ঐ ছোট্ট ভিজিটগুলোতেই নরউইচকে খুব সুন্দর লাগে। পরে তো আমরা নরফোক, নরউইচের বহু জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি। সানড্রিংহাম, রোক্সহাম ব্রডস, ক্রোমার, লোয়েস্টফট, গ্রেট ইয়ারমাথ...কত অদ্ভূত সুন্দর সব জায়গা। আমাদের এখানে যাঁরাই বেড়াতে আসেন, সবাই খুব পছন্দ করেন নরউইচকে। শান্ত, নিরাপদ শহর। স্কটল্যান্ডের মতো অত শীত নেই। মানুষ এখানে উষ্ণ, বন্ধুবৎসল আতিথ্যপরায়ণ, সমাজেও আমরা এক হয়ে মিশে গেছি। কমিউনিটির সহযোগিতা অনবদ্য। আর এখন এত অনুষ্ঠান হয়, যেখানে মেলামেশার সুযোগ হয়, জানবার সুযোগ হয়। আমাদের বাচ্চাদের জন্য আর ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যও আমি মনে করি নরউইচ চমৎকার একটি শহর। আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে একমত, আমরা আর কোথাও যেতে চাই না, অনেক হলো একেক জায়গায় থাকা।